কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

পর্যালোচনা, প্রমাণ , সুপারিশ

তত্ত্বাবধানে

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (দা:বা:)

প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক

ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

সভাপতি: সম্মিলিত কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বাংলাদেশ

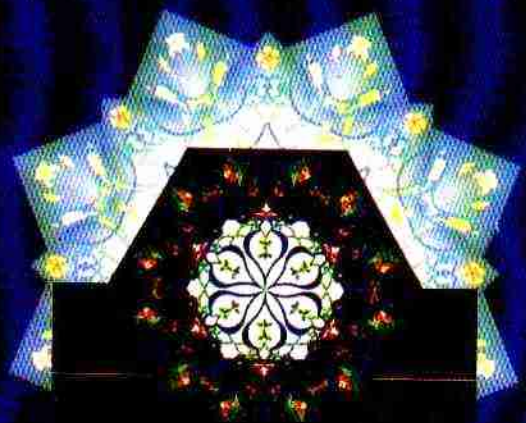

সংকলন ও সম্পাদনায়

মুফতী মীযানুর রহমান সাঈদ

মুফতী, মুহাদ্দিছ ও শিক্ষাসচিব

ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ

প্রকাশনায়

ফক্বীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা।

কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

পর্যালোচনা, প্রমাণ , সুপারিশ

তত্বাবধানে

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (দা:বা:)

প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক

ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

সভাপতি: সম্মিলিত কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বাংলাদেশ

সংকলন ও সম্পাদনায়

মুফতী মীযানুর রহমান সাঈদ

মুফতী, মুহাদ্দিছ ও শিক্ষাসচিব

ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ

প্রকাশনায়

ফক্বীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশেন বাংলাদেশ

ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা।

কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে
নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
পর্যালোচনা, প্রমাণ , সুপারিশ

তত্ত্বাবধানে
ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (দা:বা:)
প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।
সভাপতি : সম্মিলিত কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বাংলাদেশ

সংকলন ও সম্পাদনায়
মুফতী মীযানুর রহমান সাঈদ
মুফতী, মুহাদ্দিছ ও শিক্ষা সচিব
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ

প্রকাশ কাল: এপ্রিল ২০১১ইং
মূল্য: ১৫ টাকামাত্র

প্রকাশনায়
ফক্বীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা।

সম্মিলিত কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বাংলাদেশের সভাপতি, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক ফক্বীহুল মিল্লাত হযরত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (দা:বা:) এর বাণী

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কালাম "কুরআনে কারীম" এবং মহানবী (সা:) এর বাণী "হাদীছে পাক" মানুষের কাছে আছে বলেই মানুষ সৃষ্টিজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। এর মাধ্যমেই তারা সভ্য-সর্বোত্তম। না হয় অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বোৎকর্ষ প্রযুক্তি যেখানে নিস্তব্ধ সেখানে সৃষ্টি জগতের ছোট ছোট প্রাণীই সচল এবং সতেজ।

মাত্র কয় দিন হলো, জাপানে সুনামীর আঘাতে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। এর পরপরই প্রকাশিত হয় জার্মান বিজ্ঞানীদের এক আশ্চর্য গবেষণা রিপোর্ট। তাতে বলা হয়েছে "আধুনিক প্রযুক্তিতে জাপানের মানুষদের ভূমিকম্পের ছোবল থেকে বাঁচাতে পারেনি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। কিন্তু ভূমি কম্পের পূর্বাভাস দিতে পারে পিঁপড়া.....।" (সূত্র: ইন্টারনেট)

তা থেকে প্রমাণিত হয় মানব জাতির উৎকর্ষতা ও শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড তাদের সীমিত জ্ঞান বিজ্ঞান হতে পারে না। বরং তাদের শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড হলো একমাত্র ঐশী বাণী তথা কুরআন এবং হাদীছে রাসূল (সা:)।

সুতরাং যাদের হাতে কুরআন ও হাদীছ যত বেশী সংরক্ষিত এবং সম্মানিত সে মানুষগুলোই তত উত্তম ও উন্নত মানুষ হিসেবে পরিগণিত। এতে দ্বিমত করার কোনই অবকাশ নেই।

অত্যন্ত দু:খের সাথে বলতে হয় আজ বাংলাদেশের মত বৃহৎ একটি মুসলিম দেশে নারী উন্নয়ন নীতির নামে সম্পূর্ণ কুরআন ও হাদীছ বিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন করে তা মন্ত্রী পরিষদে অনুমোদন করে আইনে পরিণত করার চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার। যা পুরো দুনিয়ার মুসলমানদের হৃদয়কে করেছে জর্জরিত।

সরকারের পক্ষ থেকে বারংবার বলা হচ্ছে নারী নীতিমালায় কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কিছু নেই। কিন্তু আলেম ওলামার দাবী এতে বহু ধারা আছে যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। এসব দেখে আমি অসুস্থতা

সত্বেও "নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১" নিজেই পড়ে দেখি। তাতে যা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে তা থেকে বুঝা যায় এই নীতিমালার বেশ কিছু ধারা কুরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার পাশাপাশি মানবতা বিরোধীও। সুতরাং এই নীতি মালা শুধু মুসলমান নয় অন্য ধর্মের লোকেরাও মেনে নিতে পারে না।

এই নারী নীতিমালার পক্ষ বিপক্ষ মিডিয়াতে বিভিন্ন বক্তব্য আসতে থাকে। তাই সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে মূল বিষয়টি সম্পার্কে অবগত করানোর লক্ষ্যে আমি ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের উস্তাদ মাওলানা মুফতী মীযানুর রহমান সাহেবকে নীতিমালাটি গভীর ভাবে অধ্যায়ন করে পর্যালোচনা পূর্বক একটি রিপোর্ট তৈরী করার পরামর্শ দিই।

মাশাআল্লাহ তিনি সংক্ষিপ্ত সময়ে মেহনত করে নীতিমালাটিতে কুরআন ও হাদীছের সাথে সাংঘর্ষিক ধারাগুলো চিহ্নিত করে শরয়ী প্রামাণ্যসহ একটি প্রতিবেদন পেশ করেন।

বিগত ৩১মার্চ ২০১১ ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ বসুন্ধরা মিলনায়তনে দেশের শতাধিক অরাজনৈতিক শীর্ষস্থানীয় ওলামায়েকেরামের বৈঠকে প্রতিবেদনটি তুলে ধরা হয় এবং সকলের সম্মতিক্রমে এর কপি সরকারের দায়িত্বশীল চারটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

বিষয়টি সর্বস্তরের মুসলিম জনতার অবগতির জন্য উক্ত প্রতিবেদন একটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করার পরমার্শ চাইলে তাতে আমি সম্মতি জ্ঞাপন করি।

পরিশেষে আমি বলব কুরআন ও হাদীছ যে দেশের মানুষের কাছে জীবনের চেয়ে প্রিয় সে দেশের সরকার নিশ্চয়ই এর বাইরে অবস্থান করতে পারেন না। তাই আমি সরকারের প্রতি আশা করব এদেশের কোটি কোটি মুসলমানাদের হৃদয়কে জর্জরিত না করে স্বয়ং সরকারও কুরআন ও হাদীছ রক্ষার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে এবং নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক ধারাগুলো বাদ দিয়েই নীতিমালাটি আইনে পরিণত করবে।

আল্লাহ সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

(ফক্বীহুল মিল্লাত) মুফতী আব্দুর রহমান (দা:বা:)

লেখকের কথা

সকলের জানা, ইসলামী তাহযীব,তামাদ্দুন পৃথিবীবাসীর কাছে এক অনন্য বিস্ময়ের নাম। যার পরশে ধন্য হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী দিকভ্রান্ত মানুষ। সৌহার্দপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা, পারিবারিক নিয়মনীতি আর পরস্পর আত্মিক বন্ধন রক্ষায় ইসলাম প্রণীত বিধানই তার মূল কারণ। ইসলামের ক্রমবর্ধমান এ উন্নতি আর বিশ্বব্যাপী ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না তাগুতী শক্তি। উঠেপড়ে লেগেছে, এই মহাযাত্রা রোধে। পায়তারা করছে, পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থায় ফাটল ধরানোর। এ লক্ষ্যে গ্রহণ করছে, বিভিন্ন পদক্ষেপ। শোনাচ্ছে, মুখরোচক শ্লোগাণ। এ ধারাবাহিকতায় গৃহীত সর্বশেষ পদক্ষেপের নাম জাতিসংঘ কর্তৃক "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ" 'সিডও' এর বাস্তবায়ন। নানা অজুহাতে বাধ্য করছে, মুসলিম দেশগুলোকে স্বস্ব সংবিধান পরিবর্তন করে হলেও তা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের। নাম দেয়া হচ্ছে "নারী উন্নয়ন নীতি"র মত আবেগপ্রবণ শব্দে।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, পৃথিবীর দ্বিতীয় মুসলিম রাষ্ট্র "বাংলাদেশ" সিডও সনদ বাস্তবায়নে অনুস্বাক্ষর কারীদের অন্যতম। ১৯৯৭, ২০০৪, ২০০৮ আর সর্ব শেষ ২০১১ সালে বিভিন্ন সরকার পশ্চিমাদের চাপেই তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার ফলশ্রুতিতে আজকের এ নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১। এতে অনেকগুলো ধারা কুরআন সুন্নাহ এবং ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুন বিরোধী। বিতর্কিত ধারাগুলোর মধ্যে কিছু ধারার বক্তব্য অস্পষ্ট হলেও উদ্দেশ্য একই।

৯০ ভাগ মুসলমানের এদেশে, পীর আওলিয়ার পূণ্য ভূমিতে পশ্চিমা ধাঁচে প্রণীত নীতিমালা প্রয়োগে আঘাত লেগেছে গোটা জাতির হৃদয়ে। শুরু হলো হক্ব পন্থীদের নারী নীতিমালা বাতিলের আন্দোলন, মিছিল, মিটিং, শ্লোগান। ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ আন্দোলনে নেমে আসলেও হটকারী কিছু মানুষ তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে থাকে বিভিন্নভাবে। হক্কানী ওলামাদের উদ্দেশ্যে কটাক্য, অশোভনীয়, অপমানজনক বক্তব্য আসছে সংবাদ পত্রে। বলা হচ্ছে আলেম ওলামারা আসলে না পড়ে, না বুঝে এগুলো বলছে। নীতিমালাতে কুরআন বিরোধী কিছুই নেই ইত্যাদি। সরকারের এমপি মন্ত্রীরাও পিছিয়ে নেই এই ময়দানে। তাঁরা নীতিমালা বিরোধীদের দমন, নিপীড়নের হুমকি দিয়ে চলেছে। আর তা চরম আকার ধারণ করে ধর্মমন্ত্রণালয় কর্তৃক মাত্র দু'টি ধারার অপব্যাখ্যা দিয়ে লিফলেট বিতরণের পর। অথচ বিতর্কিত ধারার সংখ্যা অনেক।

উদ্ভূত পরিস্থিতির শুরু থেকে দেশের প্রায় প্রতিটি এলাকা থেকেই এ বিষয়ে ফোন আসতে থাকে। আবার কেউ বা স্বশরীরে এসে জিজ্ঞাসা করে কি আছে নারী নীতিমালার মধ্যে? প্রযুক্তি অনুন্নতির কারণে প্রণীত নীতিমালা সকলের কাছে পৌছানো দু:সাধ্য। আবার শব্দের মারপেচে ভরা নীতিমালা সকলের বোধগম্য হওয়াও কঠিন। এহেন পরিস্থিতিতে, ঈমানের দাবীতে ২০০৮ সালে এ বিষয়ে মতামত দানে গঠিত কমিটির একজন্য সদস্য এবং ফতওয়া বিষয়ে হাইকোর্টে মতামত প্রদান কমিটির একজন সদস্য হিসেবে আমার বিবেক নাড়া দিয়ে উঠে। প্রয়োজন অনুভব করি এ বিষয়ে কিছু লিখার। ইতোমধ্যে নীতিমালাটি পৌছে যায় হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত দা.বা. এর কাছেও। তিনি অসুস্থতা সত্বেও পুরো নীতিমালা পড়ে আমাকে নির্দেশ দিলেন এ বিষয়ে পর্যালোচনামূলক একটি প্রতিবেদন তৈরী করার জন্য।

নীতিমালা ২০১১ হাতে নিয়েতো আমি নির্বাক! এ কি? এটাতো ১৯৯৭ আর ২০০৮ এর নীতিমালারই প্রতিচ্ছবি। তাহলে ২০০৮ সালে আমাদের প্রস্তাবনা ও সুপারিশের কি হলো। হুজুরের নির্দেশে স্বল্প সময়ে সংক্ষেপে বিতর্কিত ধারাগুলোর পর্যালোচনামূলক একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরী করি। পরে প্রতিবেদনটি ওলামায়েকেরামের সম্মতিক্রমে সদয় অবগতি, বিভ্রান্তি দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রেরণ করা হয় প্রধান মন্ত্রীসহ চার জন মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট। প্রতিবেদনটি সময়ের দাবী বলে বিবেচিত হয় সকলের কাছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ওলামায়েকেরামের অনুরোধ আসতে থাকে প্রতিবেদনটি বর্ধিত কলেবরে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করার। তাই হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত দা.বা. এর পরামর্শ ও সম্মতি ক্রমে প্রতিবেদনটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রতিবেদনটি তৈরী এবং এর প্রকাশনার যাবতীয় কাজে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ করে ফক্বীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারী জেনারেল মুফতী আরশাদ রহমানী সাহেবের। যিনি পুস্তিকাটি প্রকাশ করার ব্যাবস্থা করেছেন।

সময় স্বল্পতার কারণে শাব্দিক ও তথ্যগত ভুল থাকা স্বাভাবিক। কোন প্রকার ত্রুটি কারো দৃষ্টিগোচর হলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের লক্ষ্যে আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ রইল। আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন এবং সত্যকে বুঝে তদানুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মুফতী মীযানুর রহমান সাঈদ

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم وبعد

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ কি ও কেন?

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সৃষ্টির সেরা ঘোষণা করে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন (দ্র.সূরা ১৭:৭০) তিনি মানবজাতিকে নারী ও পুরুষ দুইভাগে বিভক্ত করে সৃষ্টি করে তাদেরকে পরস্পরের সহযোগী করেছেন। যে নারী বা পুরুষ সর্বাধিক ধর্মপরায়ন আল্লাহ তাকে সর্বাধিক মর্যাদাবান ঘোষণা করেছেন। (দ্র.৪৯:১৩)

মহান আল্লাহ পৃথিবী পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পন করেছেন মানবজাতির উপর। নারী ও পুরুষ উভয়ে মিলে এ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। দায়িত্ব ও কর্তব্যের পার্থক্যের কারণে তাদের মধ্যকার অধিকার ও সুযোগ সুবিধায় কিছুটা তারতম্য হওয়াই স্বাভাবিক।

পুরুষের পাশাপাশি নারীরও উন্নতি না হলে ব্যক্তি, সংসার ও সমাজের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। এই লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, সেই নীতিমালা যেন নারীকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় না করায়। তা যেন সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস, সংবিধান ও দেশের প্রচলিত আইনের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। মানুষের মধ্যে কার কি অধিকার তা কুরআন-সুন্নাহ-এ বলে দেয়া হয়েছে। ন্যায্য পাওনা ও অধিকারের বিষয়ে কুরআন মজীদ ও সুন্নাহর নির্দেশনা সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘ কর্তৃক যে সকল আন্তর্জাতিক সনদ গৃহীত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো প্রণীত হয় পাশ্চাত্যের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে। এর সাথে অনেক ক্ষেত্রে ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভংগীর বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। তাই জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন নীতিমালা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ না করে গ্রহণ বা বর্জন করা যাবে না। কারণ মুসলমানগণ কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী কোন নীতিমালা গ্রহণ করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন

ماكان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعصى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.

"আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিলে সেই বিষয়ে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা কোন মুমিন নারীর ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকিবে না। কেহ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা:)কে অমান্য করিলে সে তো স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হবে " (সূরা আহযাব, আয়াত নং ৩৬)

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে:

ماآتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديدالعقاب.

"রাসূল (সা:) তোমাদেরকে যাহা দেন তাহা তোমরা গ্রহণ কর এবং যাহা হইতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তাহা হইতে বিরত থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তো শাস্তিদানে কঠোর।" (সূরা হাশর আয়াত নং ৭) আরো বলা হয়েছে:

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولى الامر منكم فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا.

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান আনিয়া থাক তাহা হইলে আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বের অধিকারী। কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হইলে উহা পেশ কর আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের (বিধানের) কাছে। ইহাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর"। (সূরা নিসা, আয়াত নং ৫৯)

বিগত ২৪-২-২০০৮ তারিখে তত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ও ৮/৩/২০০৮ তারিখে ঘোষিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ কে কেন্দ্র করে জনমনে নানাবিধ সংশয় সৃষ্টি হয় এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তা বাতিলের জোর দাবী উঠে। এর প্রেক্ষিতে গত ২৭/৩/২০০৮ তারিখে জনাব এ,এফ. হাসান আরিফ, মাননীয় উপদেষ্টা, আইন, বিচার ও সংসদ, ধর্ম এবং ভূমি, মেজর জেনারেল এম এ মতিন বিপি (অবঃ) মাননীয় উপদেষ্টা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইকবাল, মাননীয় উপদেষ্টা, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং মেজর জেনারেল গোলাম কাদের (অব:), মাননীয়

উপদেষ্টা, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র সচিব জনাব আব্দুল করিম এর উপস্থিতিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সভাকক্ষে ওলামা-মাশায়েখদের একটি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর উক্ত নীতিমালা পর্যালোচনা করার জন্য ২০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সভায় আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কমিটি ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে তাদের সুপারিশমালা তৈরি করে পেশ করবে।

তদপ্রেক্ষিতে উক্ত কমিটি একাধিকবার বৈঠক করে আলোচ্য নীতিমালা ২০০৮ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে একটি সুপারিশমালা প্রস্তুত করে।

উক্ত নারী নীতিমালা ২০০৮এ ৫টি অধ্যায়, ১৩৬টি ধারা ও ২১টি উপধারা ছিল।

কমিটি একাধিকবার বৈঠকে বসে নীতিমালাটির প্রতিটি ধারা-উপধারা ভালভাবে পাঠ করে গভীরভাবে পর্যালোচনা করে। নীতিমালাটিতে অনেক ভাল ভাল ধারা ও বিষয় ছিল, যা নারীর উন্নয়নের জন্য খুবই প্রয়োজন, সহায়ক ও সময়ের দাবি।

তবে কিছু কিছু ধারা এমনও পাওয়া গেছে যা পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী। এমন ধারা ১৫টি। কমিটি সর্বসম্মতভাবেই এই ধারাগুলোকে কুরআন সুন্নাহর পরিপন্থীরূপে চিহ্নিত করে সংশোধনী প্রস্তাবসহ লিখে দেয়।

উক্ত সুপারিশমালা মাননীয় আইন ও ধর্মীয় উপদেষ্টা জনাব এ এফ হাসান আরিফ এর হাতে মুফতী নূরুদ্দীন (রহ:) এর নেতৃত্বে তুলে দেয়া হয়েছিল। এ সুপারিশমালা মূল্যায়ন করত: তারই আলোকে নারী নীতি মালা ২০০৮ প্রণয়ন করবেন বলে আশ্বাস দেন এবং কমিটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় করেন। অত:পর তত্বাবধায়ক সরকার নারী নীতিমালাটি স্থগিত করে।

বর্তমান সরকার হঠাৎ গত ৭ই মার্চ ২০১১ মন্ত্রী সভায় "নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১" এর খসড়া অনুমোদন করে বলে সংবাদ পত্রে খবর প্রকাশ হয়। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) পরিবেশিত খবরে বলা হয় "ভূমিসহ সম্পদ সম্পত্তিতে ও উত্তরাধিকারে নারীর সমান অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর খসড়া অনুমোদন করেছে মন্ত্রীসভা। এটি কার্যকর করার জন্য কোন আইন করা হবে না। নতুন নীতিতে উত্তরাধিকারসহ উপার্জন ও বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদে নারীকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকার দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর সম অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে"। (কালের কণ্ঠ ০৮-০৩-২০১১)

এ খবর প্রকাশ হওয়ার পর সারা দেশের ওলামা-মাশায়েখ ও ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনতা বর্তমান "নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১" এর ব্যাপারে বিভিন্নভাবে আপত্তি ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন। ইতোমধ্যেবসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের মুফতীয়ানে কেরাম "নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১" বার বার পড়ে দেখেছেন। তাতে দেখা গেছে ২০০৮ সালের নারী নীতিমালার সাথে বর্তমান নীতিমালার তেমন কোন পার্থক্য নেই। শুধু ধারাগুলোর সিরিয়াল নম্বরে ব্যবধান করা হয়েছে এবং কোন কোন ধারায় শাব্দিক কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে মাত্র। তাই আমরা বর্তমান নারী নীতিমালার সব ধারা উপধারা পূর্ণরূপে গবেষণা চালিয়ে যে সব ধারা-উপধারা কুরআন সুন্নাহ তথা ইসলাম বিরোধী বলে পরিলক্ষিত হয়েছে, ২০০৮ সালে ওলামা কমিটির পর্যালোচনাটি সামনে রেখে বিষয়গুলি আরো বিস্তারিতভাবে দলীল প্রমাণের আলোকে এখানে পেশ করার প্রয়াস পেয়েছি। আশা করি ওলামায়েকেরামসহ সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলমান, বিশেষ করে সরকারের মাননীয় মন্ত্রী ও এমপি মহোদয়গণ বিষয়টি পড়ে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন।

প্রথমে "নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১" এর যে সব বিষয় আপত্তিকর ও কুরআন সুন্নাহ এর সাথে সাংঘর্ষিক তা সংক্ষিপ্ত ভাবে তুলে ধরা হলো। অত:পর নীতিমালার ধারা ভিত্তিক পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা পেশ করা হবে।

নারী নীতিমালায় কুরআন সুন্নাহ বিরোধী মৌলিক বিষয়গুলি (সংক্ষেপে):

১। আমাদের অনুসন্ধানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বর্তমান নারী নীতিমালাটি জাতিসংঘ প্রদত্ত "সিডও" সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গিকারের কৌশল হিসেবে প্রণয়ন করা হয়েছে।

সিডও সনদের ২,৩,৯,১৩,১৬ ধারাগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। নারী নীতিমালা ২০১১ তে সিডও বাস্তবায়নের অঙ্গীকার স্পষ্টভাষায় বারবার ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন নীতিমালার ধারা ৪.১ এ বলা হয়েছে রাষ্ট্র, অর্থনীতি, পরিবার ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও)গৃহীত হয়। এ দলীল নারী অধিকার সংরক্ষনের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানদন্ড বলে বিবেচিত। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ চারটি ধারায় যথা (২, ১৩(ক) , ১৬ (ক) ও (চ) সংরক্ষণসহ এ সনদ সমর্থন করে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে ধারা ১৩(ক) ১৬/১(চ) থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা

হয়। সনদে অনুসাক্ষরকারী রাষ্ট্র রূপে বাংলাদেশ প্রতি চার বছর অন্তর জাতিসংঘে রিপোর্ট পেশ করে। সর্বশেষ ডিসেম্বর ২০০৯ সালে ও সপ্তম পিরিয়ডিক রিপোর্ট জাতিসংঘে প্রেরণ করা হয় ২রা জানুয়ারী ২০১১ তে । সিডও কমিটিতে বাংলাদেশ সরকার রিপোর্টটি উপস্থাপন করে। গুরুত্বপূর্ণ এই সনদে স্বাক্ষরকারী প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

২। এই নীতিমালায় জাতিসংঘের "সিডও" এর ধারাগুলির প্রতিধ্বনি করা হয়েছে মাত্র। অথচ "সিডও" সনদে নারীদের উপস্থাপন করা হয়েছে ইউরোপীয় জীবন ধারা ও সংস্কৃতির আলোকে। ফলে এই নীতিমালায় মুসলিম নারীর জীবন ধারা ও ইসলামী সাংস্কৃতির মোটেই প্রতিফলন ঘটেনি। যে কারণে এই নীতিমালার মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতি বর্জন করে ইউরোপীয় সংস্কৃতি অবলম্বনের জন্য সুক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

৩। ইসলাম নারী উন্নয়ন ও নারী অধিকারের সর্বোচ্চ প্রবক্তা। নারী নির্যাতন রোধে সর্বযুগে সর্বাধিক বলিষ্ঠ ভূমিকা ইসলামই পালন করেছে। পরামর্শের সকল ক্ষেত্রে নারীকে সমঅধিকার প্রদান করা হয়েছে। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের একমাত্র অধিকার পুরুষকেই প্রদান করেছে ইসলাম। সুতরাং কর্তৃত্বের প্রশ্নে নারীকে সমানাধিকার প্রদান করা হলে তা হবে সম্পূর্ণ কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী। অথচ নারী উন্নয়ন নীতিমালার বিভিন্ন ধারায় তা সুস্পষ্টই উল্লেখ করা হয়েছে। (দ্রঃ ১৯.৯ , ৩২.৯, ৩৩.৭ নারী উন্নয়ন নীতিম. ২০১১)

৪। নারী উন্নয়ন নীতিমালা যেহেতু ইউরোপিয়ান নারীর কল্পচিত্রকে সামনে রেখে প্রণিত হয়েছে। অতএব নীতিমালাটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামের অলংঘণীয় বিধান পর্দার বিষয়টির প্রতি মোটেও লক্ষ্য রাখা হয় নি। ফলে এর অধিকাংশ ধারা পর্দার বিধান লংঘণ না করে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। ফলে উন্নয়ন পরিকল্পনা হিসেবে উপস্থাপিত বিষয়গুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুরআন বিরোধিতাই প্রকাশ পেয়েছে।

৫। ইসলাম মূলত নারী-পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যে সৌহার্দপূর্ণ পারিবারিক জীবন গড়ে তুলতে চেয়েছে, নারী নীতি বাস্তবায়ন হলে তা সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। অধিকারের টানাটানিতে পারিবারিক জীবন এক সংঘাতময় যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হবে। পারিবারিক সৌহার্দ শেষ হয়ে যাবে। যা এখন ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। সুতরাং এদিক থেকে এই নীতিমালা ইসলামের পারিবারিক নীতির সাথে সাংঘর্ষিক তো বটেই, মানবতা বিরোধীও।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ : দ্বিতীয় ভাগ

☆ ১৬.১ "বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা।"

পর্যালোচনা:

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জাতীয় জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলেও সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়। বরং সর্বক্ষেত্রে সমতা বিধান করলে নারীরা অনেক ক্ষেত্রে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। যেমন দেনমোহর থেকে বঞ্চিত হবে এবং আর্থিক দায়ভার নিজেই বহন করতে হবে। সর্বক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হওয়ার কারণ হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে - (ক) কিছু ক্ষেত্রে নারী, পুরুষের চেয়ে সমতার উর্ধ্বে, (খ) কিছু ক্ষেত্রে পুরুষ, নারীর সমতার উর্ধ্বে, (গ)এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে উভয়ে একই সমতায় অবস্থিত।

পবিত্র কুরআনে বিষয়টি এভাবে তুলে ধরা হয়েছে:

ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

"ন্যায়সংগতভাবে নারীদের আছে পুরুষদের উপর তেমন অধিকার যেমনটি আছে তাদের উপর পুরুষদের অধিকার। তবে নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে এক ধাপ বেশি। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়" (২ঃ২২৮, আরো দ্র. ৪২ঃ২৭,৪৩ঃ৩২, ৪ঃ৩২)

এমতাবস্থায় জাতীয় জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলেও সর্বক্ষেত্রে কখনো সম্ভব নয়। বিধায় এ ধারাটি উপরোক্ত আয়াতসহ বহু আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক। এ কারণে অনুচ্ছেদটি নিম্নোক্তভাবে সংশোধিত হবেঃ

প্রস্তাব:

১৬.১ কুরআন ও সুন্নাহর /ধর্মীয় অনুশাসনের আলোকে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

সংযোজন:

(ক) অধিকার সংশ্লিষ্ট সবগুলো অনুচ্ছেদে সমতা, সমান অধিকার ও অগ্রাধিকার শব্দগুচ্ছ এর পরিবর্তে ন্যায্য অধিকার' শব্দগুচ্ছ প্রতিস্থাপিত হবে।

(প্রস্তাবনায় ধর্মীয় অনুশাসন বলতে ইসলামের ক্ষেত্রে সঠিক,শুদ্ধ ও সর্বযুগে স্বীকৃত অনুশাসনকে বুঝানো হয়েছে।)

☆ ১৬.৮ "নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা"।

পর্যালোচনা :

অনুচ্ছেদের বক্তব্য অস্পষ্ট। নারী-পুরুষের মাঝে প্রকৃতিগত, স্বভাবগত, সৃষ্টিগত, দৈহিক ও আইনগত এমন সব তারতম্য ও ভিন্নতা রয়েছে যা দূর করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। (৪২: ২, ৪৩:৩২, ৪:৩২)।

অতএব এক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বৈষম্য দূর করতে হবে তা চিহ্নিত করা হয় নি। বিষয়টিকে এভাবে বিশ্লেষণ করা যায় যে, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নারী-পুরুষকে কখনও সমান রূপে সৃষ্টি করেন নি। বরং সৃষ্টিগতভাবেই তাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন নারী পুরুষের গতিপ্রকৃতি, খাদ্যাভ্যাস, রুচি, শখ, পছন্দ শারিরীরক গঠন এক নয়। তদুপরি ওজন ও উচ্চতা, নাড়ী(Pulls) রক্তচাপ, হরমোন (Hormone) ও জিন (Zine) এ রয়েছে প্রচুর পার্থক্য। যেহেতু নারী পুরুষ সৃষ্টিগতভাবে সমান নয় তাই তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও কর্মক্ষেত্র এক নয়। যেমন, পুরুষ প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে এবং উপার্জন করবে। আর নারীগণ সংসার / পরিবারের দায়িত্ব পালন করবে। সন্তান ধারণ, সন্তান প্রসব ও লালন পালন করবে। তার বিপরীতে পুরুষের পক্ষে যেমন সন্তান ধারণ সম্ভব নয় তেমনিভাবে নারীর পক্ষেও প্রতিরক্ষাসহ পুরুষের কঠিন কাজগুলো করা সহজসাধ্য নয়। দায়িত্ব অনুপাতে অধিকার লাভ হয়। অধিকার সমান করতে হলে দায়িত্বও সমবন্টন করতে হয়। যা হবে বাস্তবতা, প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও অবৈজ্ঞানিক। সংগত কারণেই মুসলিম সমাজে, মানব সভ্যতায় মেয়ে অপেক্ষা ছেলের দায়দায়িত্ব বেশি। অতএব নারী পুরুষের মাঝে বিদ্যমান বৈষম্য নিরসণ করা অসম্ভব, অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক।এছাড়া উপরোক্ত ধারাটি কুরআনুল কারীমের সূরা বাক্বারা ২২৮ আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী ও সাংঘর্ষিক। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন: ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

অর্থাৎ স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী, আর

নারীদের উপর পুরুষদের রয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী ও মহা জ্ঞানী। উপরোক্ত আয়াতে পুরুষদেরকে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছে আল কুরআন। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করা হলে তা হবে আয়াতের পরিপন্থী। যা অগ্রহণযোগ্য। ধারাটি একইভাবে কুরআনের সূরা নিসা ৩৪ নং আয়াতেরও সাংঘর্ষিক। যেমন এরশাদ হচ্ছে: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم

অর্থাৎ পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এই জন্য যে, আল্লাহ তাআলা তাদের একজনকে অপর জনের উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন। আর তা এজন্য যে, তারা (পুরুষ) নিজেদের উপার্জিত অর্থ সম্পদ নারীদের জন্য ব্যয় করে।

উপরোক্ত আয়াতে পুরুষদেরকে পারিবারিক জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্তৃত্বশীল ও অধিক মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং নারী পুরুষের মাঝে এই বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণ হবে আয়াতের সাংঘর্ষিক। তাছাড়া উভয়ের মধ্যে শরীয়তের আলোকে অনেক ব্যবধান ও তারতম্য রয়েছে। যা কখনও দূর করে সমতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য উপরোক্ত ধারায় বিদ্যমান বৈষম্য বলতে যদি অন্য কিছু বুঝায় তা সুস্পষ্টভাবে নীতিমালায় উল্লেখ থাকা জরুরী। অন্যথায় উপরোক্ত পর্যালোচনাটি এই ধারার সঠিক ব্যাখ্যা বলে ধর্তব্য হবে।

এমতাবস্থায় অনুচ্ছেদটি নিম্নোক্তভাবে সংশোধিত হবে:

১৬.৮ নারী পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য কুরআন ও সুন্নাহ / প্রত্যেক ধর্মের অনুশাসনের আলোকে নিরসন করা।

☆ ১৬.১২ রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা।

এ ধারাটিতে রাজনীতি, প্রশাসন, আর্থ সামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা সংস্কৃতি, ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এবং ধারা ১৭.১ এর দ্বারা মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ যে, সমঅধিকারী তা স্বীকৃতি স্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা হয়েছে। অথচ কুরআনের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের মাঝে প্রকৃতিগত, স্বভাবগত, সৃষ্টিগত দৈহিক ও আইনগত দায়িত্ব ও কর্তব্যগত ব্যবধান ও ভিন্নতার কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত ধারা দুটিতে নারীদেরকে যে সকল ক্ষেত্রে স্বাধীন করে দেয়া হয়েছে তা

কুরআনের আয়াত وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى অর্থাৎ তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে। বর্বর যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। এই আয়াতের সাংঘর্ষিক। বিশেষভাবে ১৬.১২ ধারার শেষাংশে পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষকে সমান করাটা কুরআনের আয়াত الرجال قوامون على النساء (সূরা নিসা আয়াত ৩৪) অর্থাৎ পুরুষেরা হচ্ছে মেয়েদের উপর কর্তৃত্বশীল এর সুস্পষ্ট বিরোধী। অতএব নারীদেরকে সর্বক্ষেত্রে তাদের ন্যায্য অধিকার দেয়াটা ছিল কুরআন সুন্নাহ কর্তৃক নীতিমালা। আর এখানে সমান অধিকার দেয়াটা যে, কুরআন সুন্নাহ বিরোধী তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া পারিবারিক জীবনে সমান অধিকার দেওয়া হলে ধ্বংস হবে পারিবারিক জীবন। বিরাজ করবে অশান্তি জালাতন, বঞ্চিত হবে নারীরা তাদের অনেক ন্যায্য অধিকার থেকে। বহন করতে হবে বাড়তি বোঝা, অসাধ্যকর দায়দায়িত্ব। যা নিম্নোক্ত আলোচনা দ্বারা আরো স্পষ্ট হবে:

ক) শরীয়তের আলোকে স্ত্রী (নারী) স্বামীর কাছে মোহর প্রাপ্তি হচ্ছে ন্যায্য অধিকার। সমতার বিধান করা হলে পুরুষের জন্যও নারীর কাছে যৌতুকের মত জিনিস দাবী করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। অন্যথায় যৌতুক প্রদানে যদি নারীপক্ষ অস্বীকৃতি জানায়, সংগত কারণে স্বামী দেন মোহরে অস্বীকৃতি জানাবার অধিকার রাখবে। কারণ সকলের অধিকার সমান। মোট কথা এই ধারা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের পরিপন্থী। এরশাদা হচ্ছে:

واتوهن اجورهن فريضة (নিসা ২৮) অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে তাদের দেন মোহর আদায় করে দাও। এই আয়াতে আরো বলা হয়েছে ان تبتغوا باموالكم অর্থাৎ অর্থের বিনিময় তলব করে (মোহর আদায় করার শর্তে) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। এই আয়াতদ্বয় দ্বারা স্ত্রী মোহর প্রাপ্ত হলেন এবং স্বামীর জন্য যৌতুক গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়ে অধিকারে ব্যবধান হয়ে গেল। সমান অধিকার আর থাকল না। বরং নারীদের জন্য অতিরিক্ত অধিকারের ব্যবস্থা হল।

খ) স্ত্রীর ভরন পোষণ ও তার যাবতীয় খরচ স্বামীর উপর অর্পন করেছে কুরআন। স্বামীকে একান্ত প্রয়োজনেও স্ত্রীর সম্পদে তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে দেয়া হয় নি।

এরশাদ হচ্ছে وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف অর্থাৎ সন্তানের অধিকারী (পিতা) এর উপর স্ত্রীদের সম্পূর্ণ খোরপুষের দায়িত্ব ন্যায় সংগত অনুযায়ী। অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله الخ (সুরা তালাক আয়াত ৭) অর্থাৎ বিত্তশালীরা সামর্থানুযায়ী স্ত্রী-সন্তানের উপর ব্যয় করবে। সীমিত

উপার্জনকারীরা আল্লাহর দেয়া অর্থানুপাতে ব্যয় করবে।

নবীজীর হাদীছে এরশাদ হচ্ছে واطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون অর্থাৎ নিজেরা যে মানের খাবার খাও তাদেরকেও সে মানের খেতে দাও। যে মানের কাপড় তোমরা পরিধান কর তাদেরকেও সে মানের পরতে দাও। (আবু দাউদ নাসাঈ)

উপরন্তু স্বামী ব্যয়ে কৃপনতা করলে ইসলাম স্ত্রীদেরকে গোপনে স্বামীর সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার অনুমতি প্রদান করেছে। রাসূল (সা:) এরশাদ করেন خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف অর্থাৎ স্ত্রী ও সন্তানের খরচাদি বহনে স্বামী অস্বীকৃতি জানালে (হে স্ত্রী) তুমি তার সম্পদ থেকে (প্রয়োজন মিটানো পরিমাণ) অর্থ তার অজান্তে নিয়ে নিবে। (বুখারী শরীফ হাদীছ নং ২০৯৭)

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে, স্ত্রী তাঁর স্বামীর ভরণ-পোষণ বহন করার দায়িত্ব প্রাপ্ত নয়। বরং স্বামীর উপর স্ত্রী সন্তাদের দায়িত্বভার ন্যস্ত। তাই উপরোক্ত ধারাটি কুরআনের আয়াত ও হাদীছের সম্পূর্ণ বিরোধী।

গ) কুরআনের দৃষ্টিতে পুরুষ শর্ত স্বাপেক্ষে একসাথে সর্বোচ্চ চার জন স্ত্রী রাখার অধিকার রাখেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই নারীর জন্য এক সাথে একাধিক স্বামী রাখা বৈধ নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع অর্থাৎ তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী নারীদের বিয়ে করে নাও, দুই, তিন কিংবা চারটি। সুতরাং উপরোক্ত ধারাটি (১৬.১২) "পারিবারিক জীবনে সর্বত্র নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা" বর্ণিত আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক।

ঘ) স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গেলে বা স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর জন্য ইদ্দত পালন আবশ্যকীয়। ইদ্দত পালনের পূর্বে অন্যত্র বিবাহে আবধ্য হওয়ার কোন সুযোগ নেই। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء অর্থাৎ তালাক প্রাপ্তা নারীরা নিজেদেরকে অপেক্ষমান রাখবেন তিন ঋতু পর্যন্ত (সূরা বাকারা ২২৮) অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যু বরণ করবে এবং স্ত্রীদের ছেড়ে চলে যাবে, তখন স্ত্রীদের কর্তব্য হল নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষমান রাখা। (অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া)। অথচ স্ত্রীকে তালাক দিলে বা স্ত্রী মারা গেলে স্বামীর জন্য কোন ইদ্দতের বিধান নেই। যে কোন মুহূর্তে সে

অন্য নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার রাখে? এক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার রইল কোথায়। সুতরাং উপরোক্ত ধারা টি (১৬.১২) উল্লেখিত আয়াত সমূহের সুস্পষ্ট বিরোধী।

ঙ) উক্ত ধারা (১৬.১২) "পারিবারিক জীবনে সর্বত্র সমান অধিকার" শব্দগুলোর মধ্যে কুরআনের উত্তরাধিকার আইনগুলিও অন্তর্ভুক্ত। কারণ "সর্বত্র" শব্দটি প্রমাণ করে, পরিবারের কোন সদস্য মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ পরিত্যক্ত সম্পদ প্রাপ্যের বিষয়ে নারী পুরুষ ন্যায্যভাবে যা প্রাপ্ত হন সে ক্ষেত্রেও সমান অধিকার দেয়া হচ্ছে। সুতরাং এই অর্থে উপরোক্ত ধারাটি কুরআনের সুরা নিসা ১১,১৩,১৪ ও ১৭৬ নং আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী। কারণ এসব আয়াতে নারী পুরুষের ন্যায্য অধিকার দেয়া হয়েছে, সমান অধিকার নয়।

মোট কথা এই ধারাটি ক. থেকে ঙ. পর্যন্ত উল্লেখিত কুরআনের আয়াত সমূহের সুস্পষ্ট লংঘণ। এক মাত্র কুরআন পরিবর্তন ছাড়া পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই তা বাতিলযোগ্য।

প্রস্তাব:

অনুচ্ছেদটি নিম্নোক্তভাবে সংশোধিত হবে-

☆ ১৬.১২ রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র কুরআন সুন্নাহর আলোকে নারী-পুরুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা।

☆ ১৭.১"মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ যে সম অধিকারী তার স্বীকৃতি স্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা।

এই ধারাটির পর্যালোচনা ১৬.১২ ধারার সাথে করা হয়েছে। তাই পূনরাবৃত্তি করা হলো না।

প্রস্তাব:

ধারাটি নিম্নোক্তভাবে সংশোদিত হবে:

☆ ১৭.১ মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ আলোকে নারী ও পুরুষের যে ন্যায্য অধিকার রয়েছে তার স্বীকৃতিস্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা। (২:২২৮-৯)

☆ ১৭.২ নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ'(CEDAW) এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

পর্যালোচনা:

Convention of the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

শীর্ষক আন্তর্জাতিক সনদ এর অনেক ধারা মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতি বিরোধী। বিগত সরকারসমূহ এ সনদের আপত্তিকর ধারাসমূহের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট আপত্তি যোগসহ তাতে স্বাক্ষর করেছে। পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি" উপরোক্ত সনদের আলোকেই প্রণয়ন করা হয়েছে। (২ : ২২৮-২৩০)

উক্ত ধারাটিতে সরাসরি "সিডও" বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলামী বিরোধী সেক্যুলার ও পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতি ও আর্থসমাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে রচিত।

উল্লেখ্য "সিডও" সনদের আর্টিক্যাল নং ২ এর মূল বিষয় হলো "জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতার বিধান প্রতিষ্ঠা করা এবং সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্যমূলক নিয়ম নীতির বিলোপ সাধন"। আমরা গভীরভাবে লক্ষ করছি যে, নারী নীতিমালা ২০০৮ এর মত ২০১১ তেও প্রায় সব ক্ষেত্রে "সিডও" ২ নং আর্টিক্যালকে সম্পূর্ণ রূপে অনুসরণ ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন বর্তমান নীতিমালায়

(১) ১৬.১ রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা।

(২) ১৬.৮ নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন।

(৩) ১৬.১২ রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্ম ক্ষেত্র, আর্থসামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষের সমান অধিকার।

(৪) ১৭.১ মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ যে, সম অধিকারী তার স্বীকৃতি স্বরূপ নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ।

(৫) ২৫.১ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবন ব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তিতে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদানসহ আরো অনেক ধারা উপধারায় সিডও ধারা নং ২ কে সুকৌশলে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই নারী নীতিমালা দ্বারা কুরআনের সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত উত্তরাধিকার

বন্টনের আইনকে নীতিগতভাবে বাতিল করার পায়তারা করা হয়েছে। কেননা সকল ক্ষেত্রে সম অধিকার, সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ বাক্যের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত উত্তরাধিকারী আইনও যে, অন্তর্ভুক্ত তাতে দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোন অবকাশ নেই। যা আল কুরআনের সূরায়ে নিসা ১১,১২, ১৩,১৪,৩৮ নং আয়াত ও সূরা বাক্বারার ২৮৮ নং আয়াতের সুস্পষ্ট লংঘণ। যার বিস্তারিত বিবরণ ২৩.২৫ ধারা উদ্ধৃত হয়েছে।

বি: দ্রঃ আল কুরআনের উদ্ধৃত আয়াতসমূহে ভাই, বোন, পিতা-মাতা এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পরিত্যায্য সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছুটা বৈষম্য পরিলক্ষিত হলেও মূলত আল্লাহ তাআলা এই উত্তরাধিকার বন্টন নীতিমালায় প্রত্যেককে ন্যায্য অধিকার দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। যা গভীরভাবে পর্যালোচনা করলেই বুঝা যায়। কারণ আল্লাহ তাআলার বিধানে সম্পদ উপার্জনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে একমাত্র পুরুষকে। আর উপার্জিত অর্থে ভোগদখলের অধিকার দিয়েছে নারীকে। একারণে নারীর (স্ত্রী) আজীবন লালন পালন এবং ভরন পোষণের দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত। পক্ষান্তরে নারী (স্ত্রী) নিজের ভরণপোষণ যেমন তাকে বহন করতে হয় না তেমনি স্বামী এবং গর্ভজাত সন্তানের ব্যয়ভার গ্রহণ করাও তার দায়িত্ব নয়। অথচ পুরুষ সাবালক হওয়ার পর থেকে কুমার জীবন ও দাম্পত্য জীবন উভয় ক্ষেত্রে নিজের ব্যয়ভার, স্ত্রীর ভরণপোষণ এবং ঔরষজাত সন্তানের ব্যয়ভারের দায়িত্ব ও কর্তব্য এককভাবে বহন করে। তাই দেখা যায় পুরুষ তার পিতা ও নিকটতম আত্মীয়ের পরিত্যায্য সম্পত্তিতে যে অংশ পায় তা বিভিন্নখাতে ব্যয় হয়ে যায়। অথচ নারী পিতা ও আত্মীয়ের ত্যায্য সম্পত্তি থেকে যতটুকু পায় (ভাইয়ের অর্ধেক) তা কোন খাতে ব্যয় হয় না বরং সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে। এ কারণে ইসলাম পুরুষকে মৌলিক তিন (আরো অন্যান্য) খাতে বাজেট থাকা সত্বেও নারীর তুলনায় দুই গুণ আর নারীকে ব্যয়ের কোন খাত না থাকা সত্বেও পুরুষের এক গুণ দিয়ে সুবিচার করেছে এবং ন্যায্য অধিকার দিয়েছে। আল্লাহ তাআলার এই বন্টন বিধান বুঝাটাও তারই মহান দয়া। যারা এসব কিছু বুঝে না অথবা বুঝেও নারীদের শ্রমিক বানাতে চায় তারাই একমাত্র ইসলামের উপর নারীর অধিকার খর্ব করার অপবাদ দিয়ে থাকে। যা সম্পূর্ণ কুফরী এবং নারীদের প্রতি সুস্পষ্ট অবিচার।

প্রস্তাব:

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি থেকে উপরোক্ত ১৭.২ অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করতে হবে।

☆ ১৭.৪ বিদ্যমান সকল বৈসম্যমূলক আইন বিলোপ করা এবং আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা"।

পর্যালোচনা:

উপরোক্ত অনুচ্ছেদে বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা" এর কথা বলা হয়েছে। এই প্রস্তাব সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।

আল কুরআন প্রদত্ত ওয়ারিসী স্বত্ব আইন (আল কুরআন ৪:১১,১২ ও ১৭৬ আয়াত) ও বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন (আল কুরআন ২:২২৮-২৩২, ২৩৬-২৩৭, ২৪১; ৬৫:১-২,৪,৬) বাংলাদেশে বিদ্যমান ও কার্যকর আইনের অন্তর্ভূক্ত। উল্লেখিত দুই বিষয় সংশ্লিষ্ট কতক আইন বাহ্যিক দৃষ্টিতে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক মনে হলেও আসলে তা নয়। তা আল্লাহ তাআলার মহাপ্রজ্ঞা পূর্ণ বিধান এবং নারীর জন্য কল্যাণকর। তাঁর এই প্রজ্ঞাকে আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

প্রস্তাব:

অতএব ১৭.৪ অনুচ্ছেদটি নিম্নোক্তভাবে সংশোধিত হবে: "বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক আইন পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সংগতি রেখেই বিলোপ করা এবং আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ (মুফতী), ও নারী আইনজ্ঞের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

☆ ১৭.৫ "স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন ধর্মের কোন অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত আইন বিরোধী কোন বক্তব্য প্রদান বা অনুরূপ কাজ বা কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করা।

পর্যালোচনা:

১৭.৫ অনুচ্ছেদকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে। ধর্মীয় বিধানের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান সত্বেও তা যার স্বার্থের প্রতিকুলে যাবে সে সেটিকে ভুল ব্যাখ্যা/অপব্যাখ্যা/ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ইত্যাদি বলতে পারবে। তাতে ধর্মীয় অনুশাসনকে কেন্দ্র করে অযথা বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রবল আশংকা রয়েছে। (সূরা নিসা, আয়াত ৫৯)

প্রস্তাব:

উপরোক্ত অনুচ্ছেদটি নিম্নোক্তভাবে সংশোধিত হবে:

১৭.৫ স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন ধর্মের কোন অনুশাসনের সাথে নারী স্বার্থ বিষয়ে অসংগতি মনে করা হলে সে ক্ষেত্রে স্ব স্ব ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কমিশনের অভিমতের আলোকে তা নিরসন করতে হবে।

☆ ১৭.৬ বৈষম্যমূলক কোন আইন না করা বা বৈষম্যমূলক কোন সামাজিক প্রথার উন্মেষ ঘটতে না দেয়া।

প্রস্তাব:

উপরোক্ত অনুচ্ছেদটি নিম্নোক্তভাবে সংশোধিত হবে।

☆ ১৭.৬ ধর্মীয় অনুশাসনের সাথে বৈষম্যমূলক কোন আইন প্রণয়ন না করা।

☆ ১৭.৯ পিতা ও মাতা উভয়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচিতির ব্যবস্থা করা। যেমন জন্মনিবন্ধনকরণ, সকল সনদপত্র, ভোটার তালিকা, ফরম, চাকরির আবেদনপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদিতে ব্যক্তির নাম প্রদানের সময় পিতা ও মাতার নাম উল্লেখ করা"।

পর্যালোচনা:

বাহ্য দৃষ্টিতে অনুচ্ছেদের বক্তব্য আপত্তিকর মনে না হলেও এর মধ্যে নিহিত আছে ইসলাম ও মানবতা বিরোধী একটি হীন উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য সমাজে বিশেষত ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশসমূহে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে নারী পুরুষের একত্রে বসবাস (Live Together) ও ব্যভিচারজনিত সন্তান উৎপাদন আইনত বৈধ এবং ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী এসব সন্তানের আইনত পিতা-মাতা হিসাবে স্বীকৃত।

উপরোক্ত অনুচ্ছেদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে দূরারোগ্য ব্যাধি এইডস এর অন্যতম উৎস ব্যভিচার অনাচারকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অনুপ্রবেশ করানোর ষড়যন্ত্র করা হয়েছে এবং ব্যভিচারীকে ব্যভিচারজাত সন্তানের পিতা বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যা পবিত্র কুরআন (৩৩:৫) ও রাসূলুল্লাহ (সা) এর বাণীর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলামী বিধান মতে ব্যভিচারজাত সন্তান, পিতৃ-পরিচয়হীন সন্তান এবং অভিশাপযুক্ত শপথকারিনীর (মুলা'ইনা) সন্তান স্ব স্ব মায়ের পরিচয়ে পরিচিত হয়, মায়ের বংশই হয় তার বংশ পরিচয় এবং মাতা-সন্তান পরস্পরের ওয়ারিস হয়। আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে কঠোর

শস্তি। ব্যভিচারী স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য দিলেও ঐ সন্তানের পিতা বলে গণ্য হয় না।

যা নিম্নোক্ত ৭.২ ধারাতে আরো স্পষ্ট করা হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে

"২০০৯ সালে মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের মাধ্যমে মা কর্তৃক সন্তানকে নাগরিকত্ব প্রদানের বিধান সন্নিবেশিত করা হয়"।

সুতরাং উপরোক্ত ধারাদ্বয় পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫ নং আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন:

ادعوهم لابائهم هواقسط عند الله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم فى الدين ومواليكم

অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহর কাছে বাধ্যতামূলক/ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধু রূপে গণ্য হবে।

কুরআনের এই আয়াতে পিতার পরিচয়ে সন্তানের পরিচিতি বাধ্যতামূলক/ন্যায় সঙ্গত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এর বিপরীত যে অন্যায়, তা সুস্পষ্ট। সুতরাং শুধুমাত্র মাতার পরিচয়ের বিষয়টি কেবল মাত্র ঐ ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক/ন্যায় সঙ্গত বলা যেতে পারে, যে ক্ষেত্রে সন্তানটি অবৈধভাবে জন্ম গ্রহণ করবে। কারণ এ বিষয়ে ফিকহ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হেদায়ায় বলা হয়েছে: ولو كان القذف تنفى الولد نفى القاضى نسبه والحقه بامه অর্থাৎ আর যদি (পিতা) সন্তানের পরিচয় অস্বীকার করে (স্ত্রীর উপর) অপবাদ আরোপ করে তাহলে বিচারক (পিতার সঙ্গে) সন্তানের বংশ সম্পৃক্তি নাকছ করে দিয়ে মায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিবেন। এই গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে : ولو قذفها با لزنا ونفى الولد ينفى القاضى نسب الولد ويلحقه بامه অর্থাৎ আর যদি স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয় এবং সন্তানকে অস্বীকার করে তাহলে বিচারক সন্তানের পিতৃ পরিচয় নাকছ করে তাকে আপন মাতার সাথে সম্পৃক্ত করে দিবে। (হেদায়া খন্ড২, পৃ: ৪১৯)

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও ফিক্বহ-শরীয়তের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, উপরোক্ত ধারাগুলো কুরআন ও শরীয়তের স্পষ্ট বিরোধী।

মোট কথা হলো বৈধ সন্তানের ক্ষেত্রে পিতার পরিচয় বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি মায়ের পরিচয়ও বিদ্যমান থাকা মোটেও শরীয়ত বিরোধী নয়। তবে অবৈধ সন্তানের ক্ষেত্রে মায়ের পরিচয় যুক্ত করা ইসলামের দৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক। তখন পিতার পরিচয় যুক্ত করা যাবে না।

প্রস্তাব:

অতএব ১৭.৯ অনুচ্ছেদটি এভাবে সংশোধিত হবে: "বৈধ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ পিতা-মাতা উভয়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচিতির ব্যবস্থা করা। যেমন জন্মনিবন্ধীকরণ, সকল সনদ পত্র, ভোটার তালিকা, ফরম, চাকরীর আবেদন পত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদিতে ব্যক্তির নাম প্রদানের সময় পিতা ও মাতার নাম উল্লেখ করা"।

☆ ১৮.১ "বাল্য বিবাহ, কন্যা শিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচারের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা।

পর্যালোচনা:

প্রচলিত নিয়মে ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ের বিবাহকে বাল্য বিবাহ গণ্য করা হয়। অথচ শরীয়তের বিধান অনুসারে মেয়ে সাবালিকা হলেই বিবাহের উপযুক্ত হয়ে যায়। তাই এটাকে বাল্য বিবাহ বলা ঠিক নয়, বরং সাবালিকা বলে গণ্য করা উচিত। তাছাড়া মেয়ে সাবালিকা হওয়ার পূর্বে তার অভিভাবক (পিতা বা দাদা) কর্তৃক বিবাহ দেওয়াকে উৎসাহ দেয়ার মত বিধান না থাকলেও যদি তারা বিবাহ দেন তা বাতিল বলে গণ্য হয় না। তাই উক্ত ধারায় বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ নীতি কুরআন ও হাদীছ বিরোধী। আল কুরআনে এরশাদ হচ্ছে : واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن الخ অর্থ: তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের বয়স বৃদ্ধির কারণে ঋতুবতি হওয়ার আশা নেই, তাদের ইদ্দতের ব্যাপারে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা জেনে রেখো, তাদের ইদ্দতের সময় হচ্ছে "তিন মাস"। এই তিন মাসের বিধান তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কারণে যাদের এখনো ঋতুকাল শুরুই হয়নি। (সুরা তালাক আয়াত ৪) এই আয়াতে যেসকল মেয়েদের প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়ার কারণে ঋতু শ্রাব এখনও শুরু হয়নি তাদের তালাকের ইদ্দতও "তিন মাস" উল্লেখ করা হয়েছে। আর ইদ্দতের প্রশ্ন তালাকের পরেই হয়ে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তালাকের কোন প্রসঙ্গ আসতে পারে না সুতরাং এই আয়াত দ্বারা বাল্য বিবাহর বৈধতা কুরআন দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত।

বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফসহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থাদীতে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে যে,

عن عائشة رضـ ان النبى ﷺ تزوجها وهى بنت ست سنين وادخلت

عليه وهى بنت تسع ومكثت عنده تسعا (٢ـ٧٧١ بخارى شريف، ١ـ٤٥٦ مسلم شريف)

অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) হযরত আয়শা (রা:)কে যখন বিবাহ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৬ বছর। আর বাসর রাত্রি যাপন করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৯ বছর। তাদের দাম্পত্য জীবনের সময়কাল ছিল নয় বছর (অত:পর নবীজী (সা:) ইন্তিকাল করেন)।(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

উপরোক্ত হাদীছটি বাল্য বিবাহ বৈধতা প্রমাণের উজ্জল দৃষ্টান্ত। এটাকে অবৈধ করার অর্থ হচ্ছে শরীয়তের হালালকে হারাম করে দেয়া। যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে অসম্ভব। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কঠোর নির্দেশ জারী করে বলেন : يـايها الـنبى لـما تحرم ماحل الله لك (মর্মার্থ হচ্ছে) হে নবী হালাল কাজকে হারাম করার এখতিয়ার আপনার নেই। সুতরাং বাল্য বিবাহের বৈধতাকে নিষিদ্ধ করার এখতিয়ার কারো নেই। তাই ধারাটি কুরআন হাদীছ বিরোধী।

প্রস্তাব:

অনুচ্ছেদে বাল্য বিবাহ শব্দগুচ্ছ এর স্থলে 'নাবালিকা বিবাহ নিরুৎসাহিত করা' শব্দগুচ্ছ যোগ করা যেতে পারে।

☆ ২০.২ সংঘর্ষ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

☆ ২০.৩ আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার মিশনে নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা।

পর্যালোচনা:

সংঘাত-সংঘর্ষ বিক্ষুব্ধ এলাকায় নারী কর্মীদের পাঠানো হলে তাতে তাদের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এবং দেশের ভাবমর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তা ২০.১ অনুচ্ছেদেরও পরিপন্থী। অতএব অনুচ্ছেদ দু'টি বিলোপ করতে হবে। (৩৩:৩৩)

☆ ২২.১ ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

☆ ২২.২ স্থানীয় পর্যায়ে নারীর জন্য পৃথক ক্রীড়া কমপ্লেক্স গড়ে তোলা।

☆ ২২.৩ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

☆ ২২.৪ নাটক ও চলচ্চিত নির্মাণে নারীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করা।

পর্যালোচনা

শরয়ী সীমার মধ্যে থেকে শারিরীক উন্নতির জন্য খেলা ধুলা করা, এবং ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনা সম্পর্কে জাতিকে সজাগ করার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা এবং ইতিহাস, ঐতিহ্য, অবদানকে সারা পৃথিবীর কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে শরীয়া অনুমোদিত পন্থায় প্রচারণার অবকাশ রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের জন্য উপরোক্ত (২২.১ থেকে ২২.৪) পর্যন্ত ধারায় বর্ণিত পদক্ষেপগুলো মোটেও কাম্য নয়। কারণ এর মাধ্যমে এক দিকে যেমন লংঘণ করতে বাধ্য ইসলামের মৌলিক বিধান তথা পর্দা ইত্যাদি, অন্যদিকে এই পদক্ষেপ সামাজিক ও মানবিক দিক থেকেও অগ্রহণযোগ্য। বিশেষজ্ঞমহল মনে করেন ইভটিজিং প্রতিরোধে সরকার যখন বিপাকে, তখন উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে আত্মঘাতির শামিল। কেননা বর্তমান ক্রীড়া ও চলচিত্রগুলো যে, অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, নগ্নতা ও সন্ত্রাসকে উস্কে দেয় এ ব্যাপারে বিজ্ঞমহল একমত। উপরন্তু এর মাধ্যমে শরীয়তের একটি মৌলিক বিধান পর্দার সুনিশ্চিত লংঘণ অনিবার্য। তাই ধারাগুলোয় বর্ণিত বিষয়গুলো শরয়ী দৃষ্টিকোণে বাস্তবায়ন করা না গেলে অবশ্য বিলোপ করতে হবে।

প্রস্তাব:

বিনোদনের ক্ষেত্রে শরীয়াত বিরোধী অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, নগ্নতা ও সন্ত্রাসকে উৎসাহদানকারী কর্মকান্ড পরিহার করা।

☆ ২৩.৫ "সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া"।

পর্যালোচনা:

২৩.৫, এই ধারাটি অস্পষ্ট হওয়ায় সর্বাধিক বিতর্কিত। কারণ সম্পদ বলতে সব ধরনের সম্পদ বুঝায়। সব ধরনের সম্পদে স্থাবর/অস্থাবর এবং উত্তরাধিকারী সম্পদ অন্তর্ভুক্ত। উপরন্ত নীতিমালার ২৫.২ উপধারায় নারীদের সম্পদের বিবরণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋন, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রদান করা"। ধারাটিতে সমান অধিকার না বলে "পূর্ন নিয়ন্ত্রণের অধিকার" প্রদান বলা হলেও "উত্তরাধিকার" শব্দ উল্লেখ থাকায় আলোচ্য ধারাটিতে সম্পদের ব্যাখ্যার মধ্যে যে উত্তরাধিকারও অন্তর্ভুক্ত তা অতিশয় স্পষ্ট। সার কথা ২৩.৫ ধারায় সম্পদ বলতে উত্তরাধিকারী সম্পদও অন্তর্ভুক্ত এটি ২৫.২ ধারা দ্বারাই সুস্পষ্ট বুঝানো হয়েছে। সুতরাং সরকারের

বিভিন্ন মহল থেকে যে বলা হচ্ছে, "নীতিমালায় কোথাও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমান অধিকারের কথা নেই"। এই বক্তব্যটি বর্ণিত ধারার অপব্যাখ্যা বা চাতুরী অথবা জাতিকে বোকা বানানোর অপকৌশল মাত্র। তাছাড়া ভবিষ্যতে কেউ এ কথাটির (সম্পদ) ব্যাখ্যা চেয়ে আদালতে রীট করলে আদালত সংগত কারণে উত্তরাধিকারের বেলাও সমান অধিকারের কথা বলে কুরআনের নীতির বিরুদ্ধে রায় দিতে বাধ্য হবে।

উল্লেখ্য যে, ২৫.২ এর উপধারায় অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রদান করার বিষয়টি শরীয়ত বিরোধী নয়। তাই এই ধারার অজুহাতে উত্তরাধিকারে সমান অধিকার প্রদান করা হয়নি বলার কোন যৌক্তিকতা নেই। সুতরাং উক্ত ধারাদ্বয়ের মাধ্যমে নারী নীতিমালা যে, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমান অধিকার দিচ্ছে তাই স্পষ্ট। যা কুরআনুল কারীমের সুরায়ে নিসা ১১,১২,১৩,১৪ ও ১৭৬ নং আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী। যার সামান্য ব্যাখ্যা নিম্নে দেয়া হলো:

সুরায়ে নিসার ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين-----

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা (তোমাদের) সন্তানদের সম্পর্কে (এমর্মে) বিধান জারি করছেন যে, এক পুত্র সন্তানের অংশ হবে দুই কন্যা সন্তানের সমান। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما অর্থাৎ এ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ফরজ তথা অবশ্য পালণীয় বিধান। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار خلدين فيها وذلك الفوز العظيم

অর্থাৎ এগুলো (কুরআনের উত্তরাধিকার বন্টনের বিধান হচ্ছে) আল্লাহ তাআলার সীমারেখা/নীতিমালা (যেব্যক্তি এই সীমারেখা/নীতিমালার ভিতরে থেকে) তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। সেখানে সে চিরকাল, বসবাস করবে। এ হবে এক মহাসাফল্য।

সুরায়ে নিসার ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

من يعصى الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين

অর্থাৎ পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের (সা:) উল্লেখিত বিধিবিধান / নির্দেশ অমান্য করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা লংঘণ করবে আল্লাহ তাআলা তাকে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে

সে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। সুতরাং নারী নীতিমালার ২৩.২৫ নং ধারাটি সম্পদের ক্ষেত্রে কুরআনের উল্লেখিত আয়াতসহ অনেক আয়াতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

প্রস্তাব:

অতএব ধারাটির বক্তব্য অবশ্যই পরিস্কার করতে হবে। ধারাটি নিম্নোক্তভাবে সংশোধিত হবে।

২৩.৫ ধর্মীয় অনুশাসনের আলোকে সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে তার ন্যায্য সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া।

☆ ২৫.১, ২৫.২ অনুচ্ছেদের বক্তব্যও অস্পষ্ট। বাহ্যিক ব্যাখ্যা অনুসারে উক্ত অনুচ্ছেদটিও ২৩.৫ অনুচ্ছেদের ন্যায় কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। এ অনুচ্ছেদও নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করতে হবে।

প্রস্তাব:

২৫.১, ২৫.২ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরী বিষয়াদি, যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, তথ্য, সম্পদ, ঋণ, প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি উপার্জনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী ন্যায্য সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা। তবে উত্তরাধিকার সূত্রে ত্যাজ্য সম্পদে নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে স্ব স্ব ধর্মের উত্তরাধিকার স্বত্ব আইন প্রযোজ্য হবে। (৪:১১)

☆ ৩২.১ রাজনীতিতে অধিকহারে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

☆ ৩২.৭ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩শতাংশে উন্নীত করা ও বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

☆ ৩২.৮ স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

পর্যালোচনা:

নীতিমালার এই তিনটি ধারা (৩২.১,৩২.৭,৩২.৮) ইসলাম, গণতন্ত্র এবং সংবিধান পরিপন্থী। এমনকি অনুমোদিত এই জাতীয় নারী নীতিমালারও পরিপন্থী। এই নীতিগুলো পুরুষদের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যমূলক এবং নারীদের ক্ষেত্রে চরম পক্ষপাতপূর্ণ।

তাই জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার উপধারা ৩২.১,৩২.৭,৩২.৮ এ উল্লিখিত নারীদের সংরক্ষিত আসন এবং তাতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিধানাবলী পুরোপুরিভাবে বাতিল করতে হবে।

সার সংক্ষেপ কথা হচ্ছে:

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর কোন বিধানের খেলাপ কোন আইন-কানুন প্রণয়ন বা কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না।

আমাদের প্রস্তাব

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির অনেকগুলো ধারাই কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক এবং এ নীতিমালা বাংলাদেশের সংবিধান, সমাজব্যবস্থা, ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, যার ফলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে এ নীতিমালা চরম আঘাতে হেনেছে। এটি বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রণীত হলে বর্তমান সমস্যার সৃষ্টি হতো না। এই সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি সংশোধন করে প্রকাশ করা হলে জনগণ আশ্বস্ত হবে এবং সংকট নিরসন হবে।

"নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১" এর বিষয়ে সরকারের ভূমিকা ও আমাদের কথা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীপরিষদে গত ৭ মার্চ খসড়া অনুমোদন করা হয়েছে "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১"। এখবর 'বাসস' কর্তৃক প্রচার করার পর দেশের সর্বস্তরের ওলামা মাশায়েখের পক্ষ থেকে এর কঠোর প্রতিবাদ করা হয় এবং বলা হয় নীতিমালাটির বহু ধারা কুরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। এতে দেশ ব্যাপী সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বিক্ষোভের ঝড় উঠে এবং নানামুখী বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। সরকারের মন্ত্রীমহোদয়গণ জোরালো বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন যে, নীতিমালাটিতে ইসলাম ও কুরআন বিরোধী কিছু নেই এবং এটি কোন আইনও নয়। যারা এই নীতিমালার বিরুদ্ধে অবস্থান করবে তারা জঙ্গি, মিথ্যাবাদী, মুরতাদ ও দেশদ্রোহী। মন্ত্রী-এমপি মহোদয়দের এসব বক্তব্যে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তারা যেন ইসলাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করছেন। তবে প্রধান মন্ত্রী একাধিকবার তাঁর বক্তব্যে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, "আমার সরকার কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন পাশ করেনি। ভবিষ্যতেও করবে না। নারী নীতিমালার কোন কোন ধারা কুরআন

বিরোধী তা আমাদেরকে বলুন"। প্রধান মন্ত্রীর এই বক্তব্যে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের দ্বার উন্মোক্ত হতে পারে বলে আমাদের ধারণা। এ কারণে ইসলাম নারীকে যে অধিকার ও মার্যাদা দিয়েছে তা ব্যাপকভাবে জনগণকে অবহিত করা এবং নারীর অধিকার আদায় সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা নারী উন্নয়ন নীতিমালা কিসের ভিত্তিতে এবং কেমন হওয়া উচিৎ? তা স্পষ্ট করা জরুরী মনে হচ্ছে। একারণে নিম্নোক্ত কয়েকটি কথা পাঠকের সামনে তুলে ধরছি।

ক) ইসলামই নারীর সর্বোচ্চ মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। ইসলাম নারী ও পুরুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারীদেরকে দিয়েছে জান-মালের নিরাপত্তাসহ সর্বোচ্চ সম্মান।

☆ জাহেলী যুগে যেখানে মেয়ে শিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়া হত, নারীদের হাটে বাজারে পশুর মত বিক্রি করা হত, দাসী হিসেবে ব্যবহার করা হত, কন্যা সন্তানের জন্মের সংবাদে পিতা মাতা বিমূর্ষ হত সেখানে মহান সৃষ্টি কর্তা কুরআন মজীদে এসব মানহানীকর কর্মকান্ডের সমালোচনা করেছেন : اذا بشر احدكم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم অর্থ যখন তোমাদেরকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তোমাদের চেহারা মলিন হয়ে যায়, যা আদৌ উচিৎ নয়।

☆ মহানবী (সা:) নারী সমাজের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে বলেনঃ মেয়ে শিশু বরকত ও কল্যাণের প্রতিক।

☆ তিনি আরো বলেন: যে ব্যক্তি তিনটি, দু'টি অথবা একটি কন্যা সন্তান যথাযথভাবে লালনপালন করবে সে জান্নাতি। স্বয়ং মহানবী (সা:)ও ছিলেন চার জন কন্যা সন্তানের পিতা।

☆ নবীজী (সা:) আরো বলেন: তোমাদের কারো যদি কন্যা ও পুত্র সন্তান থাকে, আর সে যদি তাদের জন্য কিছু (পুরস্কার স্বরূপ) দিতে চায়, তাহলে প্রথমে তা মেয়ের হাতে তুলে দিবে। মেয়ের পছন্দের পর পুত্র সন্তানকে দিবে।

☆ স্ত্রীদের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা:) এরশাদ করেন: المرأة الصالحة من السعادة উত্তম স্ত্রী সৌভাগ্যের পরিচায়ক। (মুসলিম শরীফ)।

☆ তিনি আরো বলেন خياركم خياركم لنسائهم তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। (তিরমিযী শরীফ) নারী হিসেবে মায়ের মর্যাদার বিবরণ দিতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেন: فان الجنة تحت اقدام الامهات অর্থাৎ সন্তানের জন্য মায়ের পায়ের নিচেই রয়েছে জান্নাত।

☆ বিধবাদের অধিকার সম্পর্কে নবীজী (সা:) এরশাদ করেন : الساعى على الارملة كالمجاهد فى سبيل الله واحسبه قال كالقائم

الذى لا يفتر وكصائم الذى لا يفطر

অর্থাৎ যারা বিধবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী এবং নিরলস নামাযী ও সদা রোজা পালনকারী (বোখারী ও মুসলিম শরীফ)

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে সুরা "নিসা" (নারী) নামে নারীর অধিকার ও কর্তব্য সংক্রান্ত বৃহৎ একটি "সূরা" নাযিল করা হয়েছে। যা পুরুষের বেলায় এভাবে হয়নি। উপরোক্ত কারণে অমুসলিম বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক 'জর্জ বার্নার্ডস'ও স্বীকার করেছেন একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা:)ই নারী জাতিকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করেছেন। অতএব ইসলামই একমাত্র সারা বিশ্বের সকল ধর্ম ও মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে যে, নারী জাতির ন্যায্য অধিকার, সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করেছে একমাত্র ইসলাম। অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদ তা দিতে পারে নি।

খ) নারী জাতির সম্পদের উৎসসমূহ ও অধিকার সংরক্ষণ:

ইসলামপূর্ব যুগে নারীগণ সম্পদের মালিক হওয়া দূরের কথা নিজেরাই ছিল বাজারজাত পণ্য তুল্য। ইসলামই নারীদেরকে সম্পদে পূর্ণ মালিকানা ও ন্যায্য অধিকার দিয়েছে। আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

واتوهن اجورهن فريضة তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নির্ধারিত বিনিময় (মোহর) দিয়ে দাও। আরও বলা হয়েছে :

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسن

পুরুষগণ তার অর্জিত সম্পদের মালিক হবে, নারীগণও তাদের অর্জিত সম্পদের মালিক হবে।

মোটামোটি নারীদের সম্পদের উৎস তিনটি:

১। বিবাহের সময় স্বামীর কাছ থেকে এক কালীন প্রাপ্ত অর্থ (মোহর)।

২। পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, স্বামী ও সন্তানদের পরিত্যাক্ত সম্পদ তথা উত্তরাধিকার সম্পদ।

৩। নিজেদের অর্জিত সম্পদ।

উল্লেখ্য যে, আয়ের এসব উৎসসমূহ থাকা সত্বেও নারীদের ব্যয়ের কোন খাত নেই। কারণ তার নিজ ভরন পোষণও নিজ দায়িত্বে নেই। বিবাহের পূর্বে এর দায়িত্বভার পিতার উপর, বিবাহের পর স্বামী ও সন্তানের উপর ন্যাস্ত। ছেলে পিতার ত্যাজ্য সম্পদ থেকে যেটুকু পায় তা অনেক খাতে ব্যয় হয়ে যায়। আর মেয়ের ব্যয় খাত না থাকায় সম্পূর্ণ অর্থ সংরক্ষিত থাকে। এমতাবস্থায় নারীকে পুরুষের সম্পত্তি প্রদানে সমান দেয়ার প্রস্তাব কান্ড জ্ঞানহীন, অবৈজ্ঞানিক। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, নারী পুরুষের এই পার্থক্য দায়িত্বের

ব্যবধানের কারণে। ফলে যেখানে দায়িত্বের কোন ভেদাভেদ নেই সেখানে অধিকারেও কোন পার্থক্য করা হয়নি। যেমন কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার পিতা মাতা ও সন্তান বিদ্যমান থাকলে তখন ঐ মৃতব্যক্তির পিতা (পুরুষ) মাতা (নারী)কে সমানভাবে ষষ্ঠাংশ দেয়া হয়েছে কুরআনের বিধানে। এরশাদ হচ্ছে:

ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد

যদি এমন কোন পুরুষ বা মহিলার সম্পত্তি বন্টন হয় যার পিতা-মাতা সন্তান বলতে কেউ নেই, তবে তার পৈপিত্রেয় একজন ভাই বা বোন রয়েছে তাদের প্রত্যেকে সমানভাবে ষষ্ঠাংশ পাবে। এরশাদ হচ্ছে:

وان كان الرجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس

এই দুটি আয়াতে নারী পুরুষের মাঝে উত্তরাধিকার বন্টনে আল্লাহ তাআলা সমান দিয়েছেন। অতএব উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম লিঙ্গভেদে নয় বরং তারতম্যের কারণে (অধিকার ও দায়িত্বের মাঝে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে) ছেলে মেয়ের অংশ বেশকম করেছে।

তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা নারী পুরুষের মাঝে আমল ও তার প্রতিদান পুরুস্কারের ক্ষেত্রে কোন ব্যবধান রাখেননি। বরং সমান অধিকার দিয়েছেন।

এরশাদ হচ্ছে : من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة অর্থ: যে ঈমানদার পুরুষ বা মহিলা নেক আমল করবে আমি অবশ্য তাদেরকে পবিত্র জীবন দান করব। অর্থাৎ সৎকর্মের দ্বারা পুরুষ যে জান্নাত লাভ করতে পারে, নারীও সে জান্নাত লাভে ধন্য হতে পারে। পুরুষ জেহাদের ময়দানে মারা গেলে শহীদ, নারীরা প্রসূতী ঘরে মারা গেলে শহীদা। পুরুষ নিজের অর্জিত সম্পদ থেকে দ্বীনের কাজে দান করলে যে মর্যাদার অধিকারী হবে, নারী তার সন্তানকে দুধ পান করানোর মাধ্যমেও সে মর্যাদা লাভে ধন্য হবে। এককথায় পুরুষ তার দায়িত্ব পালন করে যে পুরস্কার ও মর্যাদা লাভ করে নারীও তার দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর নিকট ঐ পুরস্কার ও মর্যাদার অধিকারী হয়।

আসল কথা হচ্ছে ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম। তাই ইসলামের বিধানসমূহ প্রকৃতির অনুকূলে। আর ইসলাম বিরোধিতা মানে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ, যা সভ্যতা ধ্বংসের নামান্তর। সঙ্গত কারণে মুসলিম সমাজে মানবসভ্যতার লক্ষ্যে মেয়ে অপেক্ষা ছেলের দায়দায়িত্ব বেশী। উভয়ের কর্মক্ষেত্র ও দায়িত্বের পরিধিও সমান নয়। তাই উভয়ের মধ্যে সম্পদসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবন্টন, সমান অধিকার, সমতা প্রতিষ্ঠা কোন ক্রমেই ন্যায় সঙ্গত হতে পারে না। সে কারণে ইসলাম উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে মেয়ের তুলনায় ছেলেকে বেশি দেয়ার বিধান করে নারীকে ন্যায্য অধিকার দিয়েছে। আর এ নারী নীতিমালা সম্পূর্ণ তার সাথে সাংঘর্ষিক। তাই দেখা যায় যে, কুরআনের এ উত্তরাধিকারী

বিধান/আইন ১৯৪৭ এর পর থেকে ভারতও পাকিস্তানে এবং ১৯৭১ এর পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশে বলবৎ রয়েছে। ভারত সরকারও মুসলমানদের এই আইনে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেনি। তাই আমরা মনে করি বাংলাদেশে শুধু ইসলামের বিরুদ্ধে নয় বরং কোন ধর্মের বিরুদ্ধে কোন আইন বা নীতিমালা করা সঙ্গত হতে পারে না।

গ) যেসব সঙ্গত কারণে নারী নীতিমালা ২০১১ গ্রহণযোগ্য নয়:

১। কোন দেশে আইন বা নীতিমালা তৈরী হয় সেদেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, আবহওয়া, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ও চেতনার উপর ভিত্তি করে। তাই ইউরোপ আমেরিকার জন্য যে নীতিমালা প্রযোজ্য বা উন্নয়নে সহায়ক মনে হবে, তা আমাদের দেশের জন্য উপযুক্ত মনে করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

২। উন্নয়নের মানদন্ড কি তা আগে ঠিক করে নেয়া উচিৎ। আমরা জানি, উন্নয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে সুখ শান্তি লাভ করা। এদিকে ২০০৭ এর আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের জরীপ রিপোর্টে দেখা যায়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশটি সুখী দেশ হলো, এশিয়ার মুসলিম দশটি দরিদ্র রাষ্ট্র। যার মধ্যে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশও রয়েছে। অথচ পৃথিবীর অসুখী দেশসমূহের তালিকার শীর্ষে রয়েছে তথাকথিত উন্নত বিশ্বের দাবীদার ইউরোপ আমেরিকার সেরা দশটি দেশ। আর তা হচ্ছে নারী পুরুষের সমান অধিকারের দেশ। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, উন্নয়ন, সমৃদ্ধি আর সুখ, শান্তি এক নয়। যে উন্নয়নে সুখ শান্তির পরিবর্তে অশান্তি বৃদ্ধি পায়, সে উন্নয়ন জাতির কাম্য হতে পারে না। তাই নারী নীতি মালা দ্বারা বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কোন প্রকার সহায়ক হওয়ার প্রশ্নই আসে না। বরং দেশটি আরো বহুবিদ অশান্তির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে।

নারী উন্নয়ন নীতি মালা কেমন হওয়া উচিৎ:

মানুষ সামাজিক জীব। অন্যদিকে প্রকৃতির অংশ। তাই মানুষকে জীবন ধারণ, ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক ও সামাজিক উভয় বিধানই মেনে চলতে হবে। প্রাকৃতিক বিধান লংঘণ করলে ধ্বংস অনিবার্য। আর সামাজিক বিধান ভঙ্গ করলে বিরাট বিপর্যয়। সামাজিক বিধানসমূহের মধ্যে ধর্মীয় বিধিবিধানই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর ইসলাম ধর্ম নারীকে যে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছে, তার বিকল্প কোথাও নেই। বিধায় কুরআনী বিধান অনুযায়ী নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন করাই হবে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণ কর।

আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআন সুন্নাহর আলোকে জীবন যাপন করার তৌফীক দিন। আমীন।

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين